দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকট এবং বাংলার 'অনাগত সমাজ'

পারভেজ আলম

ভাষা হল অধিকার উচ্চারণের প্রধান মাধ্যম–আহমদ ছফা

জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা;
দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকট

ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুকাল পর থেকেই সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারাটি বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে ধারাটি সংসদে বাতিল করা হল। এর ফলে ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে কাশ্মীরের যতটুকু স্বায়ত্তশাসন ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটল। অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার ও কাশ্মীরের প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার যতটুকু স্বাধীনতা কাশ্মীরের নাগরিকরা ভোগ করত, তা-ও ভারত সরকার কেড়ে নিল। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে কাশ্মীরের অধিভুক্তি ও অবস্থান ১৯৪৭ সাল থেকেই একটি বিতর্কিত ও রক্তস্নাত বিষয়। যদিও ৩৭০ ধারাটি বিস্তৃত করার মাধ্যমে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ইতিপূর্বে বাড়িয়েছে, কিন্তু ধারাটি বাতিল করার সাহস ও সামর্থ্য এই দীর্ঘ সময়ে ভারত সরকারের হয়নি। আজকে ইতিহাসের যে বিশেষ মুহূর্ত বা ওয়াক্তে এসে শুধু ৩৭০ ধারাটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাতিলই করল না, বরং কাশ্মীরের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তা কার্যকরও করতে পারল; তার অনুধাবন করাটা জরুরি। পৃথিবীর দিকে দিকে নয়া-ফ্যাসিবাদী রাজনীতির যে বিস্তার ঘটেছে তার মধ্যেই কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতা হরণ করেও নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক অটুট রাখতে পারছেন। কিন্তু ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার এই দানবীয় ও বিজয়ী রূপ একই সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (এবং খোদ ভারত রাষ্ট্রই) যেসব পূর্বকল্পের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর ধসে পড়ারও বার্তা বহন করে। এই ঘটনাকে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে বর্তমানে হাজির হওয়া জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্রের সংকট হিসেবে পাঠ করা প্রয়োজন। মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশেও এই সংকট বিভিন্ন রূপে উন্মোচিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে এবং বাংলাদেশের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে পাঠ করাটা তাই জরুরি। তা না করা গেলে সাম্প্রদায়িকতা-বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে না। নিজ দেশের প্রাণ, প্রকৃতি এবং প্রতিবেশের আত্মনিয়ন্ত্রণও তারা হারাতেই থাকবে।

বিজেপির উত্থান, ভারতজুড়ে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও ভাষা-জাতির ওপর হিন্দুত্ববাদীদের সাম্প্রদায়িক-বর্ণবাদী আগ্রাসন, আসামের এনআরসি, ৩৭০ ধারা বাতিল–এই সমস্ত ঘটনাই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রচারিত 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' বুলিটিকে ফাঁপা ও অর্থহীন বানিয়ে ফেলেছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা অবশ্য অনেক আগেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তবে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ কিছু বলে স্বীকার না করলেও ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই মানেন। নিশ্চিতভাবে যা বলা যায় তা হল, অফিসিয়ালি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্রটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার পরিচালনা, হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচারণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দি ভাষার আধিপত্য কায়েম এবং হিন্দি-হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্রমাগত একদেহ বানিয়ে প্রচার করার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক পরেই ভারত রাষ্ট্রটি হিন্দুত্ববাদীতে পরিণত হয়েছে (খালিদি, ১৫৪৬)। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদের প্রবল হাজিরাই একসময় পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে বাস্তব করে তুলেছিল। আহমদ ছফা যথার্থই বিচার করেছিলেন যে আধুনিক ভারতের ধারণা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের ধারণা কল্পনার মাধ্যমে, যেই প্রাচীন ভারত আর্য ভারত বা হিন্দু ভারতেরই অপর নাম (ছফা, ১০১)। আজকে আসামে যেখানে এনআরসির মাধ্যমে ভারতে বসবাসকারী বহু মানুষের ভারতীয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হল, সেখানে কাশ্মীরের জনগণকে শুধুই ভারতীয় নাগরিক বানিয়ে ফেলা হল। এ দুই ঘটনা ভারত রাষ্ট্রের দুই প্রান্তে দুটি খুবই ভিন্ন ধরনের ঘটনা মনে হলেও দুটিই ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ নির্ভর ফ্যাসিবাদের উত্থানের ফলাফল। এ দুই ঘটনায় প্রমাণ হয় যে ভারতে এখন হিন্দি-হিন্দু জাতীয়তাবাদ যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে তাতে ভাষা ও ধর্মের দিক থেকে ভারতের নাগরিকদের বৈচিত্র্য এবং তাদের অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ–দুটিই হুমকির মুখে পড়েছে। অর্থাৎ 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' তথা ধর্মনিরপেক্ষতার যে পূর্বকল্পিত ভিত্তির ওপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দাঁড়িয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়–তা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরাজয় এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি একই সাথে ভারতে বহু ধর্মীয়-সম্প্রদায় এবং ভাষা-জাতির অস্তিত্বকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। ভারত রাষ্ট্রটি আজ অবধি যেসব জাতীয়তাবাদ (ধর্মনিরপেক্ষ হোক বা হিন্দু) চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, সেসবের মাধ্যমে ভারতের বহু জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যে সম্ভব না তা-ও পরিষ্কার হয়েছে। মোটকথা, বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোর (যা বর্তমানে ভারতীয় লুটেরা পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতাচর্চার ওপর দাঁড়িয়ে আছে) মধ্যে ভারতের জাতিগত সংকটের সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

ভারতের জাতি সমস্যা বর্তমানে যেই রূপ ধারণ করেছে, তাকে যদিও বাংলাদেশ সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বার বার ঘোষণা করে আসছে, কিন্তু অন্তত পক্ষে আসামের এনআরসি যে সরাসরি বাংলাদেশের জন্যও একটি জরুরি রাজনৈতিক পর্যালোচনার বিষয়, এই বিষয়ে বাংলাদেশে সরকারের বাইরে প্রায় দেশের প্রায় সবাই একমত। আসামের বাংলাভাষীদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে তাদেরকে ভারতে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিক দাবি করে, যদিও তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সেখানে বসবাস করছে। আসামে বাংলাভাষীদের নিবাস তো নতুন কিছু নয়। ভারতের জন্মের বহু আগে থেকেই বাংলাভাষীরা সেখানে বসবাস করে। বাংলা থেকে আসামে কিংবা আসাম থেকে বাংলায় মানুষের হিজরত আধুনিক জাতিরাষ্ট্র

গঠনের পূর্বে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এই অঞ্চলে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মত আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম বহু মানুষকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে। এখন আবার সেইসব জাতিরাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করার জৈবরাজনীতির (biopolitics) বলি হয়ে মানুষ নির্বাসিত হওয়ার হুমকির মুখে পড়েছে, ঘর ও দেশহারা হয়ে ডিপোর্টেশন ক্যাম্পে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশে যাঁরা এনআরসিকে একান্তই ভারতের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে না দেখে বাংলাদেশের বিষয় হিসেবেও দেখছেন তাঁরা কেউ কেউ এই ভয়ের জায়গাটাই তুলে ধরছেন যে সাম্প্রতিক মিয়ানমার সরকার যেমন লাখো রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে, বা পাকিস্তান সরকার যেমন একাত্তরে কোটি বাঙালিকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, তেমন ভয়াবহ কায়দায় যদি না-ও হয়, অন্তত নাগরিকত্ব ও জীবিকা কেড়ে নেয়ার মাধ্যমেই লাখো বাঙালিকে আসাম থেকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার উপায় তৈরি হতে পারে। আসামের হিন্দু জাতীয়তাবাদের নেতারাই এমনটা হওয়ার আশা করছেন। সুতরাং এনআরসি নিয়ে দুশ্চিন্তা আমাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক হলেও আসামের বাংলাভাষীদের নাগরিকত্ব হারানোর এই ঘটনাকে কেবলই জনসংখ্যার সাথে যুক্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হুমকি হিসেবে দেখলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমরা ভারতের ফ্যাসিবাদী-বর্ণবাদীদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে পারব না। আবার কেউ কেউ বলছেন যে বাংলাভাষীদের একমাত্র জাতিরাষ্ট্র হিসেবেও আসামের বাংলাভাষীদের এই বিপদে বাংলাদেশের সোচ্চার হওয়া জরুরি। এই ধরনের যুক্তি অনেকটা কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুসলমান পরিচয়টি সামনে এনে বাংলাদেশের জনগণের সহমর্মিতা জানানোর প্রয়োজন তুলে ধরার মতই। আমি বলছি না যে ধর্মীয় অথবা ভাষাগত পরিচয় সামনে এনে আসাম অথবা কাশ্মীরের জনগণের অধিকারের পক্ষে সহমর্মিতা জানানো অনুচিত, কিন্তু আমরা যদি তাদের অধিকারের পক্ষে সহমর্মিতা ও সমর্থনকে ধর্মীয় অথবা ভাষা জাতীয়তাবাদী ভিত্তির ওপরই নির্ভরশীল করে ফেলি বা তা অতিক্রম না করতে পারি তাহলে ভারতের মতই বর্ণবাদী জৈবরাজনীতি বাংলাদেশেও জয় লাভ করবে; এবং ভারতের মত একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে কাশ্মীর অথবা আসামের জনগণের পক্ষে যেমন বাংলাদেশের জনগণ কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না, উল্টো তারা ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির হাতেই আরও বেশি নির্যাতন-শোষণের শিকার হতে থাকবে।

> ভারতের জাতি সমস্যা বর্তমানে যেই রূপ ধারণ করেছে, তাকে যদিও বাংলাদেশ সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বার বার ঘোষণা করে আসছে, কিন্তু অন্তত পক্ষে আসামের এনআরসি যে সরাসরি বাংলাদেশের জন্যও একটি জরুরি রাজনৈতিক পর্যালোচনার বিষয়, এই বিষয়ে বাংলাদেশে সরকারের বাইরে প্রায় দেশের প্রায় সবাই একমত।

আহমদ ছফা তাঁর ১৯৭৭ সালে লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা'য় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে আলাপ তুলতে গিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশের জন্মকে অবধারিত করে তোলা রাজনীতির ইতিহাস আলোচনা করেছিলেন। সেই সাথে নতুন জন্ম নেয়া বাংলাদেশের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বড় পরিবর্তন আশা করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ ধরে ভারতের বিভিন্ন নিপীড়িত ভাষা-জাতিও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে উজ্জীবিত হবে এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় বড় ধরনের সমাজ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, এই প্রবন্ধে ছফার এমন আশাবাদ আজকের এই ২০১৯ সালে আমাদের জন্য আদৌ কোন অর্থ বহন করে কি? তাঁর বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার আপামর জনগণের সমাজ বিপবের কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করাটাকে কি আমরা এক ধরনের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী রোমান্টিকতার বেশি কিছু হিসেবে পাঠ করতে পারি?

আমার মনে হয় প্রবন্ধটিতে ভাষা জাতীয়তাবাদকে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল একটা অবস্থান ছফা দিয়েছেন তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যেমন জরুরি, তেমনি বাংলাদেশে নতুন জন্ম নেয়া জাতির কোন ধাত বা সারমর্ম খোঁজার বদলে তার সত্তা ও অস্তিত্বের ওপর ছফা যে গুরুত্ব দিয়েছেন সেই দিকটি আমাদের জন্য বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে ছফা দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষা জাতীয়তাবাদের যে হিস্টোরিয়গ্রাফি হাজির করেছেন, তা মোতাবেক ইন্ডিয়ায় হিন্দি ভাষা এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষার আধিপত্য এ দুই ভাষার বাইরে এসব দেশের অন্যান্য ভাষা এবং সেই ভাষাভাষী জাতিগুলোর বিকাশ ঠেকিয়ে রেখেছে। অহিন্দি প্রদেশগুলো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের শিকার হচ্ছে। এই কথা '৭৭-এ যেমন সত্য ছিল, এখন তার চাইতে আরও বেশি সত্য ও প্রাসঙ্গিক। ছফার মতে, পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের বিকাশ ও অধিকারের প্রয়োজনেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশের জন্ম। এবং বাংলাদেশ যদি রাষ্ট্র হিসেবে সফল হয়, তাহলে ভারতের বিভিন্ন ভাষা-জাতিও হিন্দি ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের ভাষা ও নিজ জাতিসত্তার বিকাশে সচেষ্ট হবে।

অর্থাৎ ছফার কথা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষা জাতীয়তাবাদ যত না বিভাজনের, তার চাইতে বেশি এই অঞ্চলের বিভিন্ন নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ঐক্যের জায়গা। এই দিক থেকে ভাষা জাতীয়তাবাদের প্রতি তার নিজের যে সমর্থন, তা নিজে ঠিক প্রচলিত জাতীয়তাবাদ নয়। ভালভাবে বললে ছফা বাংলাদেশের যে জাতিগত সত্তার ধারণা হাজির করতে চেয়েছেন, তা ঠিক ডানপন্থী জাতীয়তাবাদ নয়, যা অন্য জাতিগুলোর সাথে নিজ জাতির পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতাকে (এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যদের তুলনায় নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে) তাদের মতাদর্শের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধে ছফার হাজির করা হিস্টোরিয়গ্রাফি তাঁর সময়কার বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট বস্তুবাদী ইতিহাসসম্মত। এবং যেহেতু তিনি বাংলাদেশের জাতিসত্তাকে তাঁর নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে বিচার করেছেন এবং নিপীড়নের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও মুক্তির আন্দোলনের জায়গা থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য জাতির সাথে তার ঐক্যের জায়গাটি দেখেছেন, সেহেতু ছফার এই বিচারকে মজলুমের ঐতিহ্যের সাথে খাপ খাওয়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও বলা যেতে পারে। কিন্তু ছফা তাঁর ভাষা-জাতি বিষয়ক বিচার-বিশ্লেষণগুলাতে ভাষা জাতীয়তার ধারণার তেমন কোন ক্রিটিক হাজির করেন নি।

আধুনিক যুগে ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলো যদিও মূলত ভাষা জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত (সম্ভবত এই কারণে ছফা ভাষা-জাতিকে প্রাগ্রসর ভেবেছেন), কিন্তু ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে ইতিহাসের একটা প্রগতিশীল ফ্রেমওয়ার্কে ফেলে চিন্তা করার পদ্ধতিটা আমাদের

প্রশ্ন করা উচিত। ইউরোপে ভাষা জাতীয়তাবাদের বিকাশের ইহুদিদের ইমান্সিপেশনের সুযোগ তৈরি হয়েছিল, অথচ নিজ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বহু ইহুদি নিজেকে একাত্ম করে ফেলার পরও ১৯৩০ ও '৪০-এর বর্ণবাদী রাজনীতির বলি হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধটির বিচার করতে গিয়ে সলিমুলাহ খান আহমদ ছফার জাতীয়তাবাদ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। সেই সাথে তিনি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বানানোর যে বিপদ তুলে ধরেছেন তা-ও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। খান উল্লেখ করেছেন যে একাত্তরের ২৩ ডিসেম্বর তৎকালীন তাজউদ্দীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের যে তিনটি মূলনীতির কথা উলেখ করেছিলেন সেগুলো ছিল–সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জাতীয়তাবাদের উল্লেখ তাতে ছিল না (খান, ৬৯)। তাঁর দাবি জাতীয়তাবাদ ধারণাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় চেতনা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সাথে খাপ খায় না। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে সাতচলিশ ও একাত্তরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকেই বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা তাই এক অর্থে জাতি নিরপেক্ষতাও, যা বাংলাদেশের সকল ধর্ম সম্প্রদায় এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের সমান অধিকারের নীতি। সুতরাং বাংলাদেশে জাতিনিরপেক্ষতা যদি না থাকে তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকার প্রশ্ন তোলাটাও অর্থহীন (খান, ৭০)। সলিমুলাহ খান যখন এই লেখাটি লিখেছেন তখন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিটি ছিল না, এবং তার সাপেক্ষেই বাংলাদেশে কেন ধর্মনিরপেক্ষতা নেই, সেই প্রশ্নটি ছিল। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি আবার ফেরত এসেছে। অথচ আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী একটি পর্বে বসবাস করছি।

দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ধারণাটিও ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মতই অর্থহীন। একাত্তরের পর থেকেই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সমাজ জাতীয়তাবাদকে (বাঙালি, বাংলাদেশি) মোকাবেলা করার বদলে ধারণ করেছে। এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন একদল ক্রোনি সেকুলারিস্ট, যাঁরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের বৈপবিক রাজনীতির মধ্যে না গিয়ে শাসকশ্রেণির সহায়তায়, আইন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করতে চান। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ২০১০ সালে আবার যুক্ত হয়েছে। অথচ বিগত নয় বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হতাহতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শেখ হাসিনার প্রায় একনায়ক নেতৃত্বের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে 'তেরো দফা দাবি' হাজির করা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থগত ঐক্যও আমরা এই সময়টিতে গড়ে উঠতে দেখেছি।

জাতি পরিচয়, জাতিসত্তা ও ভাষা

আধুনিক জাতীয়তাবাদ গঠিত হয় ওয়াল্টার বেনিয়ামিন কথিত 'শূন্য সমসত্ত সময়ের' (Homogenious Empty Time) মধ্যে (এন্ডারসন, ২৪)। ঘড়ির কাঁটা ও ক্যালেন্ডারে মাপা পরিমাণগত সময়ের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় সমাজের টিকে থাকার কল্পিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস নির্মিত হয়। প্রাচীন ভারত আর আধুনিক ভারতের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে বলে ধরে নেয়া হয়, শূন্য সমসত্ত সময়ের মধ্যে 'আর্য ভারত' আর 'জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার ভারত' এক ও অবিচ্ছেদ্য হিসেবে হাজির হয়। বাংলাদেশেও একাত্তরের পর হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির নামে শূন্য সমসত্ত সময়ের মধ্যে বয়ে চলা একটা জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের ধারণা জন্ম হয়েছে, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম পূর্বকল্প। জাতীয়তাবাদী চিন্তা হাজার বছর ধরে একটা জাতির মধ্যে হাজির থাকা সুনির্দিষ্ট ধাত (বংংবহপব) আবিষ্কার করতে চায়, কিন্তু তাদের এই আবিষ্কার আধুনিক জ্ঞান-ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত সত্যের বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে না। ষাট ও সত্তরের দশকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বাংলাদেশেও) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার এবং জাতীয় মুক্তির আন্দোলন যেহেতু বামপন্থীদের কাছে একই সংগ্রামের অংশ হিসেবে ধরা দিয়েছিল, তার প্রভাবেই হয়ত ছফা জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করার কথা ভাবেননি। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের মানুষের জাতিগত আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তিতে সকলে মিলেমিশে একটি সমানাধিকারের সমাজ গড়ে তোলার কাজ (ছফা, ১৩৮, ১৩৯)। বলা বাহুল্য, ছফা 'শূন্য সমসত্ত সময়ের' মধ্যে জাতীয় পরিচয় গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া ও বিপদ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।

> বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ ধরে ভারতের বিভিন্ন নিপীড়িত ভাষা-জাতিও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে উজ্জীবিত হবে এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় বড় ধরনের সমাজ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, এই প্রবন্ধে ছফার এমন আশাবাদ আজকের এই ২০১৯ সালে আমাদের জন্য আদৌ কোন অর্থ বহন করে কি?

বাস্তবে ছফার এই লেখার বহু বছর পরেও বাংলাদেশে জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি থেকে গেছে, বাঙালি বনাম মুসলিম পরিচয়ের দ্বন্দ্বটি এখনও অব্যাহত আছে। যদিও বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ২০১৩ সালের অভিজ্ঞতার পর বাঙালি ও মুসলিম ধরনের আত্মপরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে নতুন করে বাংলাদেশি পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করছেন, কিন্তু এর ফলে এদেশের মানুষের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত বিবাদ মিটে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার শেখ হাসিনার বর্তমান শাসনামলেই আমরা দেখছি যে প্রগতিশীল তরুণদের মত প্রতিক্রিয়াশীলরাও বাঙালি ও মুসলিম পরিচয়কে একদেহে ধারণ করতে পারছে। জাতীয় পরিচয় যতক্ষণ কোন না কোন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের ডাকে গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বাংলাদেশের সকল পরিচয়ের মানুষকে একদেহে ধারণ করার মত পরিচয় গড়ে তুলতে পারবে না, বরং নানা নতুন ও পুরাতন আপন-পর বিভাজনের প্রক্রিয়াকেই উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করতে থাকবে। মতাদর্শের অন্যতম প্রধান (বর্তমান দুনিয়ায় হয়ত প্রধানতম) কাজ হচ্ছে আত্মপরিচয় নির্মাণ করা, লুই আলথুজারের ভাষায় বললে–নিরেট ব্যক্তিমানুষকে কর্তা (subject) হিসেবে ডাক (interpellate) দেয়া (আলথুজার, ১৫০৩)। জাতীয়তাবাদী ও পুঁজিবাদী মতাদর্শ, উভয়েই গড়ে ওঠে একটা শূন্য সমসত্ত সময়ের মধ্য দিয়ে মানবজাতির প্রগতির ধারণার মাধ্যমে। পুঁজিবাদের কলকব্জা চালুর রাখার জন্যই এ ধরনের সময়ের ধারণা আধুনিক যুগে প্রধান হয়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন নাম নিয়ে (অথবা কোন নাম না নিয়েই) উত্তর-পুঁজিবাদী সমাজ কায়েম করা ছাড়া আধুনিক বিভিন্ন আত্মপরিচয়জাত সংকটের মীমাংসা হওয়ার কথা না। অথবা যদি আপাতদৃষ্টিতে তেমন মীমাংসা দেখাও যায়, তবে তা-ও হবে একটা

দেশে হাজির থাকা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে আপোস করেই, তার সীমার মধ্যেই।

তবে এও বলা যায় যে, 'মীমাংসা হয়ে গেছে' বলে ছফা আসলে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে একরকম কবরও দিতে চেয়েছেন। যদিও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি, কিন্তু একই সাথে তিনি বাঙালি জাতি পরিচয়ের কোন ধাত নির্মাণ করার চেষ্টাও করেননি। বাঙালি ধারণাটিকে তিনি বরং বাংলাভাষীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্ম-জাতি-নির্বিশেষে সকলের অস্তিত্বের সাথে বাঁধতে চেয়েছেন। বাঙালি পরিচয়ের এহেন বাড়তি গুরুত্ব প্রদানের সমস্যা আছে। সলিমুলাহ খান এর মধ্যে আদিবাসীদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর 'তোমরা বাঙালি হয়ে যাও' বক্তব্যের প্রতিধ্বনিও শুনতে পেয়েছেন (৬০)। কিন্তু ছফা যে বাঙালি পরিচয়ের কোন ধাত খোঁজার বদলে বাংলাদেশের জনগণের জাতিগত পরিচয়কে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামের সাথে বাঁধতে চেয়েছেন, তার জন্য তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা পাঠ করতে গেলে যেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তা হল যে 'জাতীয় ধাত' নয়, বরং 'জাতিসত্তা' এই লেখায় ছফার চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। ছফা যে সমাজ বিপব বাংলাদেশে আশা করেছেন, তার পেছনেও হাজির করেছেন অস্তিত্বের প্রয়োজনের যুক্তি (১৩৮)।

ভারতের (বর্তমানে চীনকেও ধরতে হবে) পুঁজিপতি ও তাদের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধা বিশ্বপুঁজিবাদের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতেই এই সমাজ বিপবের প্রয়োজন। ছফা বাংলাদেশের জনগণের যে জাতিসত্তার কথা বলছেন, তা সুস্পষ্টভাবেই একটি মজলুম জাতিসত্তা। নাগরিক ও মানবাধিকার হারিয়ে ফেলা উন্মুক্ত বা উন্মোচিত সত্তা এই জাতিসত্তা, শহীদ ও মোহাজেরদেরদের জাতিসত্তা। ছফার মতে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একাত্তরের পূর্বে পাকিস্তান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু 'স্মরণকালের নিষ্ঠুরতম বলি' হওয়ার পর বাংলাদেশের জনগণ 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব' বাংলাদেশের বুকে মানবে না বলেই আওয়ামী লীগ (এবং ভারতও) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মে ভূমিকা রাখতে বাধ্য হয়েছিল (১১৪)। ছফার মতে, ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয়তার ধারণা যেমন দীর্ঘদিনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল, বাঙালি জাতীয়তার ধারণার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। ব্রিটিশ আমলে দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে যেমন ভারতীয় জাতীয়তার ডিসকোর্সগুলো গড়ে উঠেছে, তেমনি হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে সংঘর্ষের কারণে মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে পাকিস্তানি জাতীয়তার ধারণা গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ভারতীয় ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বস্তুগত শর্ত এবং মতাদর্শিক গড়ন দুটিই হাজির ছিল বলা যায়। বাঙালি জাতিসত্তা সেই তুলনায় হঠাৎ করে হাজির হওয়া একটা কিছু, একাত্তরের পূর্বে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের ডিসকার্সিভ তৎপরতার মধ্য দিয়ে এই জাতির ধারণা গড়ে ওঠেনি। বরং ছফার ভাষায়–ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙালি জাতিসত্তা নিজেকে উন্মোচন করেছে (৯৮)।

উন্মোচন কথাটির অর্থ এই ক্ষেত্রে কী? যা নিজে থেকে উন্মোচিত হয় তা কোন সুচিন্তিত প্রয়াসের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিতে তৈরি হওয়া জিনিস না; শিল্প, সাহিত্য, রাজনৈতিক বুলি ও রাষ্ট্রদার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে ডিসকার্সিভভাবে উৎপাদিত কিছুও না। উন্মোচন ধারণাটি এই ক্ষেত্রে অর্থের দিক থেকে ইংরেজি রেভেলেশন বা আরবি ওহি ধারণাটির কাছাকাছি। উন্মোচিত সত্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর সত্য নয়, বরং এই সত্য আবির্ভূত হয় সজ্জার মত। এই সত্য ইতোমধ্যে হাজির হওয়া বাস্তবতা, মতাদর্শের নেকাব খুলে তা নিজেকে উন্মোচিত করে। এই সত্য তাই আমাদের বস্তুগত সত্যও বটে। মানুষ যখন নাগরিক ও মানবাধিকার হারিয়ে ফেলে, তখন তার যে জীবসত্তা উন্মোচিত হয়, তারই নাম আগামবেন দিয়েছেন 'বেয়ার লাইফ' বা উন্মুক্ত জীবন। 'বেয়ার' ধারণাটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন গ্রিক দর্শনে ব্যবহৃত ধারণা হ্যাপলোস (Haplos) বা শুদ্ধ অস্তিত্বের সমার্থক হিসেবে (আগামবেন, হোমো স্যাকের, ৮৪)। যে 'বেয়ার লাইফ' আগামবেনের মতে জাতিরাষ্ট্রের বাতেনি পূর্বকল্প (secret presupposition), তা শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনগণের জাতিসত্তা হিসেবে নিজেকে উন্মোচিতই করেনি, বরং বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রধান নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

> এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন একদল ক্রোনি সেকুলারিস্ট, যাঁরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের বৈপবিক রাজনীতির মধ্যে না গিয়ে শাসকশ্রেণির সহায়তায়, আইন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করতে চান। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ২০১০ সালে আবার যুক্ত হয়েছে। অথচ বিগত নয় বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হতাহতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শেখ হাসিনার প্রায় একনায়ক নেতৃত্বের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে 'তেরো দফা দাবি' হাজির করা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থগত ঐক্যও আমরা এই সময়টিতে গড়ে উঠতে দেখেছি।

কিন্তু সেই জাতিসত্তার গায়ে এরপর নানা মতাদর্শ ও পরিচয়ের পোশাক পরানো হয়েছে। ফলে একাত্তরে যা উন্মোচিত হয়েছিল তাকে আবার বাতেন বানিয়েই ভারত ও পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে, এবং তার সাথে পালা দিয়ে পুঁজিপতিরা নিজেদের ক্ষমতাকে জাহির করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আজকে আবার সেই উন্মোচিত জাতিসত্তার সত্যটি প্রচার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আজকে দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা যে বিশেষ ওয়াক্তে প্রবেশ করেছি, তাতে কোন মতাদর্শের নেকাবের মধ্যেই আর বাংলাদেশের জনগণের জাতিসত্তাকে, তার শুদ্ধ অস্তিত্বকে গোপন করে রাখা যাচ্ছে না, তার বেয়ার লাইফ অস্তিত্বটি পদে পদে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। শুধু বাংলাদেশেই না, আজকে এই অস্তিত্ব নিজেকে উন্মোচিত করেছে আসামে, কাশ্মীরে, আরাকানে; গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই। এই সত্যের সাক্ষী হওয়া, এই উন্মোচনের ঘটনার রাসুল হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান দক্ষিণ-এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করতে পারবে না।

অধিকার উচ্চারণের ভাষা বনাম স্পেক্টাকল

ভাষা, ধর্ম বা এই জাতীয় কোন ভিত্তির ওপর জাতীয়তার ধারণাকে দাঁড় করানোর বিপদ সম্বন্ধে এখন আর আমাদের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার পরও এই কথা বলা প্রয়োজন যে, আমরা যদি কোন

রকম বাংলাদেশি সমাজের কথা চিন্তা করি, বা যদি নতুন কোন বাংলাদেশি সমাজ নির্মাণ করতে চাই, ভাষার সাথে তার সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্ঠই না–অবিচ্ছেদ্য। এই ক্ষেত্রে আমি কোন বিশেষ ভাষার (যেমন–বাংলা, চাকমা, ইংরেজি) সাথে সম্পর্কের কথা বলছি না, যদিও বিশেষ ভাষাগুলোর মাধ্যমেই এমন সমাজ গঠিত হয়/হবে। এক বা একাধিক সাধারণ ভাষার অস্তিত্ব ছাড়া তো কোন মানবসমাজই কল্পনা করা যায় না। তবে আমি যেই সম্পর্কের কথা বলছি তার কোন বিশেষ ভাষার সাথে সম্পর্ক না, বরং সম্পর্কটা খোদ 'ভাষা'র সাথেই। ভাষার সাথে আমাদের এই সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং ঐক্যের জায়গায়ও।

এই অভিজ্ঞতা শুধু ভিনদেশি ভাষার আধিপত্য ও হুমকির মুখে নিজের ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংকটের অভিজ্ঞতা মাত্র নয়, যেই অভিজ্ঞতার কথা আহমদ ছফা তুলে ধরেছেন। আমি যেই অভিজ্ঞতার কথা বলছি তা যোগাযোগের মাধ্যম থেকে ভাষাকে জাতীয়তাবাদের প্রতীকে এবং 'স্পেক্টাকলে' পরিণত হতে দেখার অভিজ্ঞতা। হিন্দি ভাষা বর্তমান ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রধান মাধ্যমই শুধু নয়, বরং এই জাতীয়তাবাদের প্রতীকও বটে। হিন্দি ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোকে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা দেশপ্রেমের একটা শর্তে পরিণত করেছে।

ভারতে হিন্দি এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষা প্রথম থেকেই এমন প্রতীকী সম্মানের দাবিদার ছিল। কিন্তু ভাষা দুটি এ দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা কখনই ছিল না। পাকিস্তানে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টার ফল ছিল বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। ভারতে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বানানো সম্ভব না হলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণের ফলে কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়াই হিন্দু ভাষা একরকম জাতীয় ভাষার সম্মান লাভ করেছে, সেই সাথে অন্য ভাষাগুলোকে ঠেলে দেয়া হয়েছে একটা প্রান্তিক অবস্থায়। ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভোজপুরী, ব্রজভাষা, মাগধী, মৈথিলী, রাজস্থানী, ছত্রিশগড়ী ইত্যাদি ভাষাকে 'ডায়ালেক্ট' অভিধা দিয়ে হিন্দি ভাষাকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হিসেবে ডিসকার্সিভভাবে উৎপাদন করা হয়েছে (খালিদি, ১৫৪৮)।

মোদ্দাকথা, হিন্দি ও উর্দু, এই দুটি ভাষারই আছে ভারত ও পাকিস্তান–এ দুই রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এই দুটি ভাষা প্রতীকী ব্যবস্থার (Symoblic Order) বদলে নিজেরাই প্রতীক, সিস্টেম অব রিপ্রেজেন্টেশনের বদলে নিজেরাই রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে উঠেছে–এই অঞ্চলের অন্য ভাষাগুলোর আগেই। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রিপ্রেজেন্টেশনের যেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য, তা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজনীতিতে প্রথম বড়ভাবে উন্মোচিত হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান জাতির রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে, এবং হিন্দি ও উর্দু ভাষার আধিপত্যমূলক রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে। বলা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ায় এই দুটি ভাষার মধ্যেই জনগণের জীবনসংগ্রাম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগময়তার বদলে পুঁজিবাদী স্পেক্টাকলের বৈশিষ্ট্য সবার আগে ধরা পড়েছে।

আমি এখানে স্পেক্টাকল শব্দটি ব্যবহার করছি ফরাসি মার্ক্সবাদী চিন্তক গাই দেবোর্দের অনুসরণে। দেবোর্দ তাঁর স্পেক্টাকল ধারণাটি হাজির করেছেন 'সোসাইটি অব স্পেক্টাকল' নামক গ্রন্থে। বইটি তিনি লিখেছেন ১৯৬৭ সালে, আধুনিক গণমাধ্যম ও যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রে পুঁজি যেই রূপে হাজির হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তাঁর নিজের ভাষায় : "পুঁজি যখন তার সঞ্চয়ের একটা পর্যায়ে গিয়ে ছবিতে পরিণত হয়, তারই নাম স্পেক্টাকল" (দেবোর্দ ১৭)। অর্থাৎ স্পেক্টাকলের মধ্যে পুঁজি নিজেই হাজির থাকে, রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে। ভাষা, ধর্ম, দেশ, বন্ধুত্ব, প্রেম–এমন সবকিছুকেই যখন কমোডিটি বানানো হয়, ফেটিশকৃত রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে গণমাধ্যমে হাজির করা হয়, তখন তারা রূপান্তরিত হয় স্পেক্টাকলে। ভাষা ও গণমাধ্যম যখন স্পেক্টাকলে পরিণত হয়, তখন তা মানুষের যোগাযোগময়তার মাধ্যম হওয়ার বদলে উল্টো মানুষে-মানুষে যোগাযোগের পথই রুদ্ধ করে দেয়। আমাদের সময়ে এই পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। দেবোর্দ যখন এই তত্ত্ব হাজির করেছেন, বামপন্থীদের মধ্যে তখন মার্ক্সে কমোডিটি ফেটিশিজম সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় ব্রাত্যে পরিণত হয়েছিল, সেই সাথে গণমাধ্যমে পুঁজির চেহারা নিয়ে তাঁর এই মার্ক্সবাদী বিচার যথেষ্ট নতুন হওয়াতে তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

> জাতীয়তাবাদী ও পুঁজিবাদী মতাদর্শ, উভয়েই গড়ে ওঠে একটা শূন্য সমসত্ত সময়ের মধ্য দিয়ে মানবজাতির প্রগতির ধারণার মাধ্যমে। পুঁজিবাদের কলকব্জা চালুর রাখার জন্যই এ ধরনের সময়ের ধারণা আধুনিক যুগে প্রধান হয়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন নাম নিয়ে (অথবা কোন নাম না নিয়েই) উত্তর-পুঁজিবাদী সমাজ কায়েম করা ছাড়া আধুনিক বিভিন্ন আত্মপরিচয়জাত সংকটের মীমাংসা হওয়ার কথা না।

কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে গণমাধ্যমের সর্বত্র বিস্তারের যেই যুগে আমরা এখন বসবাস করছি, তাতে দেবোর্দের চিন্তা তাঁর নিজের সময়ের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য। বলিউডের সিনেমা অথবা ভারতীয় গণমাধ্যম স্পেক্টাকলের ভাল উদাহরণ, কিন্তু স্পেক্টাকল ধারণাটিকে 'মিডিয়া'র একটি প্রতিশব্দ ভাবলে ভুল হবে। স্পেক্টাকলের মধ্যে বরং মিডিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। স্পেক্টাকল হিসেবে মিডিয়ার কাজ যোগাযোগের মাধ্যম হওয়া নয়, বরং পণ্যের (কমোডিটি) মত সমাজের মানুষের মধ্যে হাজির থাকা ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যস্থতা করা (দেবোর্দ, ৭)। ভারতীয় গণমাধ্যম, বলিউডের সিনেমা এবং ক্রিকেট খেলাও যেমন শুধু যোগাযোগ আর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই হাজির নেই ভারতে, বরং নিজেরাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রিপ্রেজেন্টেশনে পরিণত হয়েছে। ভাষা, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম–এসব ক্ষেত্রে পণ্যায়িত হয়ে গেছে, মধ্যস্থতা করছে ভারতের জনগণের মধ্যে হাজির থাকা ক্ষমতা-সম্পর্কের। ফলে দেশপ্রেম, জাতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই আমাদের জীবনে হাজির হয়েছে পুঁজিপতি শাসকশ্রেণির পক্ষের মতাদর্শের বিভিন্ন রূপ হিসেবে। বাংলাদেশেও বর্তমান সরকারের আমলে স্পেক্টাকলের এই রকম চূড়ান্ত বিজয় আমরা দেখতে পাই। ধার্মিকতা অথবা দেশপ্রেম, এইসব এখন আর জীবনঘনিষ্ঠ ব্যাপার নয়; বরং মূলত 'রিপ্রেজেন্টেশনে'র বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্তরের ধার্মিকতার চাইতে তাই বহিরঙ্গের ধর্মীয় চিহ্নগুলোই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ–আইসিসের মত সংগঠনগুলো কোন সংকোচ ছাড়াই স্পেক্টাকলকে গ্রহণ করতে পারে তাদের প্রধান খোদা হিসেবে। একই কথা বলা যায় ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রেও। দেশপ্রেম এখন আর

প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশের প্রতি প্রেম ও করুণা এবং এসবের পক্ষে সর্বজনের যুগপৎ সংগ্রামের বিষয় নয়। বরং শাসকশ্রেণির প্রচারিত বিভিন্ন দেশীয় এবং জাতীয় প্রতীকের পবিত্রতা রক্ষাই দেশপ্রেমের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। স্পেক্টাকলের দুনিয়ায় রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল কিংবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান–সবার কর্মপদ্ধতি এক হয়ে গেছে; সকলের মূল কাজও একটাই–পুঁজির বিকাশ। দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার সাথে বাকি দুনিয়ার ক্ষমতা-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তা একান্তই 'লুটেরা পুঁজির বিকাশ'।

মার্ক্সের মতে, পণ্যের মধ্যে নিজের শ্রমে উৎপাদিত বস্তুর সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক এলিয়েনেশনের সম্পর্ক। পণ্যের মধ্যে সমাজের মানুষের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্ক হাজির থাকে, এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এই সামাজিক সম্পর্কের বাস্তবতা মানুষের কাছে একমাত্র বাস্তবতা বলে মনে হয় (মার্ক্স, ৬৬৪, ৬৬৫)। স্পেক্টাকলও তেমনি আমাদের সময়কার মানুষের সামাজিক সম্পর্কেরই এলিয়েনেটেড ছবি। আগামবেনের মতে, পুঁজিবাদ শুধু মানুষের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপরই দখল প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং মানুষের ভাষা যোগাযোগময় স্বভাবের ওপরই দখলদারি কায়েম করেছে। হেরাক্লিটাসের বরাত দিয়ে তিনি মানুষের ভাষিক অস্তিত্ব বা কালেমাকে (logos) সর্বজনের (common) সমার্থক ধরে নিয়েছেন। তিনি দাবি তুলেছেন যে পুঁজিবাদের হাতে সর্বজনের অস্তিত্ব বেদখল হওয়ার যে চূড়ান্ত রূপ তা-ই স্পেক্টাকল (আগামবেন, অনাগত, ৭৯)। স্পেক্টাকলের দুনিয়া এক ধরনের শুদ্ধ বিচ্ছেদের দুনিয়া–যার মধ্যে বাস্তব দুনিয়া ছবিতে এবং ছবিগুলো বাস্তবে পরিণত হয়। মানুষের জীবনের বাস্তবতা ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় ছবি ও টেক্সটের মাধ্যমে পুঁজি মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার সার্বভৌমত্ব কায়েম করে। রিপ্রেজেন্টেশন যখন মানুষের যোগাযোগময়তার মাধ্যম হওয়ার সীমা অতিক্রম করে নিজেরাই সম্মান ও পূজার দাবিদার হয়ে ওঠে, তখনই তা স্পেক্টাকলে পরিণত হয়, যা আমাদের এই সময়কার সবচাইতে শক্তিশালী তাগুত। স্পেক্টাকলের রাজত্বে খোদ ভাষাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে, পরিণত হয় স্পেক্টাকলে। মানুষের যোগাযোগময়তাই যোগাযোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। টেক্সট, ছবি, ভিডিও এবং লাইভ সম্প্রচারের প্রযুক্তিনির্ভর মিডিয়ার এই দুনিয়াতেও ফেক নিউজ ধারণাটির এত প্রবল ব্যবহার এই পরিস্থিতি বুঝতে আমাদের কিছুটা সাহায্য করে। আমাদের সময়ে ভাষা তথা মানুষের যোগাযোগময়তার এই এলিয়েনেটেড অবস্থার কারণেই আগামবেন বলেন যে, বর্তমান দুনিয়ার একটি প্রকৃত মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ শুধু পুঁজির হাতে শ্রমিকের শ্রম ও উৎপাদন ক্ষমতার এলিয়েনেশনই বিচার করবে না, বরং ভাষার সাথে মানুষের এলিয়েনেশনের বিচার এবং মোকাবেলাও করবে (৭৯)।

হিন্দি কিংবা উর্দু ভাষার মত বাংলা ভাষাও এখন একটা স্পেক্টাকলে পরিণত হয়েছে। আসলে দক্ষিণ এশিয়ার সকল ভাষা-জাতির মধ্যে আজকে ঐক্যের জায়গাও এটাই, আমাদের নিজেদের মাতৃভাষার সাথে তো বটেই, খোদ ভাষার সাথেই আমাদের বিচ্ছিন্নতা। খোদ ভাষার সাথে আমাদের সম্পর্কই এক ধরনের এলিয়েনেশনের সম্পর্ক বর্তমানে। আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার থাকলেও আমরা সেই ভাষার মাধ্যমে সহজে নিজেদের অধিকারের কথা উচ্চারণ করতে পারি না আর। কি সত্য আর কি মিথ্যা, কোন কথার কী অর্থ ধরতে হবে, কোন কথার কোন অর্থ না ধরাই ভাল, আর কোন কথার সত্যহীনতা বা অর্থহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে চুপচাপ থাকাই শ্রেয়–তা পুঁজিবাদী-ফ্যাসিবাদী শাসকশ্রেণিই এখন নির্ধারণ করে দেয়। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের খবর তাই বন্দুকযুদ্ধের একই স্ক্রিপ্টের ওপর বছরের পর বছর নির্ভর করেই প্রকাশিত হতে পারে। গণমাধ্যমের এই অর্থহীনতাকে, এর তৈরি করা বাস্তবতাকে যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বাংলাদেশের লুটেরা শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধা চীন-ভারত-রাশিয়াসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী শক্তির হাতে অধিকারবঞ্চিত ও শোষিত হওয়া জীবনের বাস্তবতাই আমাদের মেনে নিতে হবে। ভাষাকে তার তাগুত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে অধিকার উচ্চারণের মাধ্যমে পরিণত করাটা তাই বর্তমানে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের একটি সাধারণ সংগ্রাম।

এমন এক অনাগত সমাজের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে, যেখানে মাতৃভাষা মায়ের মুখের ভাষার মতই মিষ্টি ও জীবনঘনিষ্ঠ ব্যাপার হবে, প্রেম প্রকাশ ও অধিকার উচ্চারণের মাধ্যম হবে–ফেটিশ বা তাগুতের মত সীমা অতিক্রম করে পূজা দাবি করবে না।

> মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র যে সমাজের সংবিধান ছিল, তেমন সমাজ, তেমন জাতিসত্তা অস্তিত্ববান থাকে তার মধ্যে হাজির থাকা গাঠনিক ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিকতার সমাজ বিপ্লব অব্যাহত রাখার মাধ্যমে। তার বদলে কোন ভাষা বা ধর্মকে ভিত্তি বানাতে গেলে এমন সমাজ টেকানো যায় না। সেই চেষ্টাও প্রতিবিপবী।

অনাগত সমাজ

বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদ, স্পেক্টাকল ও ফ্যাসিবাদের এই চূড়ান্ত বিজয়ের সময়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় একটি সমাজ গঠনের চেষ্টা ছাড়া স্বাধীনতা ও অধিকার সহকারে টিকে থাকার কোন উপায় আমাদের জন্য অবশিষ্ট নেই। ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোন পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে এই সমাজ গঠন করা বা টেকানো যাবে না। এই দাবি করছি না যে এমন সমাজে ভাষা, সংস্কৃতি বা ধর্ম ব্যক্তিমানুষের কর্তাসত্তার বিকাশে ভূমিকা রাখবে না; কিন্তু সমাজটি নিজেকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তার অস্তিত্ব ও বস্তুগত সংগ্রামকে বাদ রেখে মতাদর্শিক ভিত্তি খুঁজবে না। এমন সমাজের গড়ে ওঠার জন্য তেমন ভিত্তির প্রয়োজনও পড়ে না, সমাজের সদস্যদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এমন সমাজের আবির্ভাব ঘটে। একাত্তরে বাংলায় যে সমাজের আবির্ভাব ঘটেছিল তা-ও ছিল এমনই একটি সমাজ।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি ধরা হয়েছে, তাজউদ্দীন দেশে ফেরার পর প্রথম বলেছিলেন তিন মূলনীতির কথা। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধান, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে তৎকালীন বাংলাদেশের কোন ভাষাগত বা ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না। পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেয়া 'অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাবিধ নৃশংস অত্যাচারে'র বিপরীতে বাংলাদেশের জনগণ 'তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপবী কার্যক্রমের' মাধ্যমে এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাংলাদেশের জনগণ বিপ্লব করেছে, কারণ পাকিস্তান সরকার তাদের বিরুদ্ধে 'নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন' চালিয়েছে। পাকিস্তান সরকারকে তারা অকার্যকর করে দিয়েছে এবং দেশের ওপর নিজেদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে নিখাদ অস্তিত্বের প্রয়োজনে। ওয়াল্টার বেনিয়ামিনের ভাষা যদি ব্যবহার করি তাহলে তাদের এই বীরত্ব ও সাহসিকতা হল খোদায়ি সহিংসতা বা ডিভাইন ভায়োলেন্স, এ মিন্স উইথাউট এন্ড, পূর্বতন ও অকার্যকর আইনি ব্যবস্থা

ধ্বংস করাই তার কাজ মূলত। বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখানো বিপ্লবী জনগণকেই গাঠনিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে ধরে এই জনগণের মধ্যে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধকে আইনি ভিত্তি দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র যে সমাজের সংবিধান ছিল, তেমন সমাজ, তেমন জাতিসত্তা অস্তিত্ববান থাকে তার মধ্যে হাজির থাকা গাঠনিক ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিকতার সমাজ বিপ্লব অব্যাহত রাখার মাধ্যমে। তার বদলে কোন ভাষা বা ধর্মকে ভিত্তি বানাতে গেলে এমন সমাজ টেকানো যায় না। সেই চেষ্টাও প্রতিবিপ্লবী। এই প্রতিবপবেই একাত্তরের পরে আমরা একাত্তরের সমাজ আর ধরে রাখতে পারিনি।

বাংলার অনাগত সমাজ তাই শুধু কোন বিশেষ পরিচয়ের মানুষের সমাজ হতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ যদি এখনও তাদের নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ধাত বা এসেন্স দিয়ে নিজেদেরকে চিহ্নিত করার চেষ্টাতেই থাকে, তাহলে স্পেক্টাকলের রাজত্বে দাসত্বই তাদের নিয়তি হবে। সময় হয়েছে আমাদের খোদ অস্তিত্ব দিয়ে নিজেদেরকে বোঝার। অস্তিত্বের দিক থেকে আমরা বাংলাদেশিরা, ভারতের বাঙালিরা এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের মধ্যে ফারাক যে নাই হয়ে যাচ্ছে, তা অনুধাবন করা জরুরি। এই অস্তিত্ব যে ইউরোপের ইহুদি আর ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মতই, সেটাও বোঝা জরুরি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার শেষ দিকে ছফা লিখেছিলেন যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে একটি সমাজ বিপবের ঝড় আসছে, আর বাংলাদেশই হতে যাচ্ছে সেই ঝটিকার প্রাণকেন্দ্র। ছফার এই প্রফেসি আজকে অনেকের কাছে একটি ভুল বা ব্যর্থ প্রফেসি বলে মনে হতে পারে। কারণ তাঁর এই লেখার পরের চার দশকে এই অঞ্চলের সমাজে নিও-লিবারাল পুঁজিবাদ আর ফ্যাসিবাদই বিকশিত হয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সকল ফ্যাসিবাদই কোন না কোন ব্যর্থ বিপবের ফলাফল। আজকের রোহিঙ্গা সংকট, আসামের এনআরসি, ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কাছে বাংলাদেশের একটি সম্ভাব্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত হওয়া, ভারত-চীন-রাশিয়ার পরিবেশবিধ্বংসী নানা জ্বালানি প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার যে বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তাতে বাংলাদেশ যে এখনও এই অঞ্চলে একটা সমাজ বিপ্লবের ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেনি, সেটাই বরং আরও ভয় ও হতাশার কথা। অনন্ত ফ্যাসিবাদের অধীনে একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ভাগ্য বরণ করতে না চাইলে বাংলাদেশকে একটি আসন্ন সমাজ বিপ্লবের কেন্দ্র হিসেবে চেনা ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় আছে কি? এই রাজনীতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিরাষ্ট্রগুলোর বেঁধে দেয়া সীমান্তের মধ্যে আটকে রাখা যাবে না, অর্থাৎ হতে হবে আন্তর্জাতিকতাবাদী। এবং মজলুম জাতিসত্তার অধিকারের এই রাজনীতিকে কোন জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিঃশেষ হতে দেয়া যাবে না। তা হতে দিলে জেতা সম্ভব না।

বাংলার অনাগত সমাজ যেমন কেবলই কোন বিশেষ পরিচয়ের মানুষের সমাজ হবে না, তেমনি হবে না কেবল মানুষের সমাজ। জাতীয় সার্বভৌমত্বের মত মানুষের সার্বভৌমত্বও সেই সমাজ বিকিয়ে দেবে। এমন সমাজে মানুষের অধিকারের ধারণা কোন জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর নির্ভরশীল হবে না, মানুষের সংজ্ঞাও প্রকৃতির ওপর প্রভুসুলভ সার্বভৌমত্বের ওপর নির্ভর করবে না। বাংলার অনাগত সমাজ হবে শুদ্ধ প্রাণের সমাজ। প্রকৃতি ধ্বংস করে সেই সমাজের প্রতিবেশ বিকশিত হবে না, বরং প্রাণের টিকে থাকার সংগ্রামেই প্রকৃতি আর প্রতিবেশের ভেদ ঘুচে যাবে সেই সমাজে। বাংলার অনাগত সমাজে সংস্কৃতি চর্চার নামে থাকবে না বর্ণবাদী আভিজাত্যের চর্চা, সেখানে বরং থাকবে কৃষ্টি-প্রতিপালন। ওয়াল্টার বেনিয়ামিনের ভাষা যদি ব্যবহার করি, তাহলে সেই সমাজে মানুষের শ্রম করবে না প্রকৃতির শোষণ, বরং প্রকৃতির গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবে (বেনিয়ামিন, ৩৮৪)। বেনিয়ামিনের ব্যবহার করা 'গর্ভ' শব্দটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আরবি 'রহম' শব্দের অর্থও গর্ভ। ইবনে আরাবিও রহম শব্দটির গর্ভ অর্থটিকে গুরুত্ব দিয়েই রহমতের ধারণাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। বেনিয়ামিন ও আরাবির চিন্তার সূত্র ধরে আমরা এও বলতে পারি যে বাংলার অনাগত সমাজ একটি রহমতের সমাজ। বাংলার এমন একটি অনাগত সমাজের মডেলকেই কেবল আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অনাগত সমাজের মডেল বলে ভাবতে পারি।

পারভেজ আলম: লেখক, গবেষক।
ইমেইল: stparvez@gmail.com

তথ্যসূত্র

[আগামবেন] [হোমো স্যাকের] Agamben, Giorgion. "Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life". Originally published as Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi editore s.p, 1995.

[আগামবেন] [অনাগত সমাজ] Agamben, Giorgion. "The Coming Community". Translated by Michael Hardt, University of Minnesota Press, 2007.

[আলথুজার] Althusser, Louis. "Ideology and Ideological State Apparatuses." Reprinted in The Norton Anthology of Theory and Criticism, 1st ed., W. W. Norton & Company, Inc, 2001

[বেনিয়ামিন] Benjamin, Walter. "On the Concept of History". Selected Writings, volume 4, 1938-1940. Translated by Edmund Jephcott and Others, Edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Harvard University Press, 1996.

[খালিদি] Khalidi, Omar. "Hinduising India: Secularism in Practice". Third World Quarterly, Vol. 29, No. 8, pp. 1545-1562, 2008.

ছফা, আহমদ, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা', বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, সম্পাদনা : সলিমুলাহ খান, অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৭।

খান, সলিমুলাহ, 'ছফাচন্দ্রিকা : বেহাত বিপ্লব ১৯৭১', বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৭।

[এন্ডারসন] Anderson, Benedict. "Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism". Verso, 2006.

[দেবোর্দ] Debord, Guy. "Society of Spectacle". Translation by Ken Knabb, Aldgate Press.

[মার্ক্স] Marx, Karl. "Capital, volume-1", Chapter 1, Section 4 (The fetishism of commodities and the secret thereof), Reprinted in The Norton Anthology of Theory and Criticism, 1st ed., W. W. Norton & Company, Inc, 2001